শঙ্খ ঘোষের কবিতায় প্রতিবাদ—এক উজ্বল উদ্ভাস

সৈকত ঘোষ

সেইভাবে দেখতে গেলে কবিতার কোনো সংজ্ঞা হয়না তবু প্রকৃত কবি ঠিক বুঝতে পারেন লেখার পর সেটি কবিতা হয়ে উঠল কিনা। কবিতা হয়ে ওঠা বা না হয়ে ওঠা নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক আছে। কবিতার গঠন বা শরীর নির্মাণ নিয়ে সেভাবে কোনো বাধ্য বাধকতা নেই, তা সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে কবির মেধা ও উপস্থাপনের উপর। এখানে কবি স্বাধীন।

শঙ্খ ঘোষ একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন—'কবিতার ভাষা যদি মুখের ভাষা না হয় তাহলে কবিতা লেখা কেন?' —সত্যই এটা ভাবার বিষয়। কবিতার আঙ্গিক নিয়ে দেশে-বিদেশে অনেক আলোচনা তথা রিসার্চ হয়েছে। এই সময়ে দাঁড়িয়ে কবিতার প্রয়োজনীয়তা কি বা এই সময়ের কবিতা কেমন হওয়া উচিত তা নিয়েও অনেক মতবাদ আছে। সময় বদলেছে, আমরা বদলেছি তার সাথে সাথে কবিতারও তো বদল দরকার। পঞ্চাশের শেষ থেকে বাংলা কবিতাতেও নতুন ভাবনা চিন্তা শুরু হয়। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই গোটা পৃথিবীর আর্থ-সামাজিক অবস্থাটা ধীরে ধীরে পালটাতে শুরু করে, আস্তে আস্তে বদলে যেতে শুরু করে জীবনযাপন, আর স্বভাবতই বদলে যেতে থাকে কবিতার ভাষা। পাতা, ফুল, প্রেম, চাঁদ, তারা এসবের জায়গায় কবিতায় ঢুকে যায় নাগরিক যন্ত্রণা, আমাদের চাহিদা, বেঁচে থাকার স্ট্রাগেল, মুক্তি, একাকিত্ব, যৌনতা, প্রতিবাদ—এই সবকিছু হয়ে ওঠে কবিতার বিষয়।

তারপর অনেকটা সময় অতিবাহিত হল। পুরোনো কবিতাকে বস্তাপচা ঘোষণা করে নতুন কবিতা তৈরির প্রসেস শুরু হল ভেতর ভেতর নতুন কাব্যভাষা নির্মান বা বিনির্মানের মধ্যে দিয়ে।

ধীরে ধীরে আজকের কবিতা হয়ে উঠল ওপেন স্পেসের কবিতা, যার বিস্তার হতে পারে অসীম। বস্তু, বিষয় এসবের কেন্দ্র থেকে ভাবনা শুরু করে তাকে ছড়িয়ে দেওয়া যায় অনন্তে... কিন্তু নতুন কবিতার নাম করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে অ্যাসেম্বেলড কবিতা। বলতে দ্বিধা নেই সেখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে এক বা একাধিক শব্দ বা লাইনের সমাহারে ঘটেছে কিন্তু কোন প্রকৃত দিশা নেই সেখানে। (এটিকে পাঠক কখনই নতুন কবিতা হিসেবে ধরতে যাবেন না তাহলে নতুন কবিতা সম্পর্কে আপনার ভ্রান্ত ধারণা তৈরি হবে)।

এই প্রসঙ্গে এক জায়গায় শঙ্খবাবু বলেছেন শব্দকে ভাঙতে গেলে বা ছন্দ নিয়ে টুইস্ট করতে গেলে প্রথমে সেটাকে জানতে হবে, গভীরে প্রবেশ না করলে কি করে নতুন সৃষ্টি সম্ভব। ভিতই যদি ঠিকমতো না থাকে তাহলে তার উপর কি করে গড়ে উঠবে নতুন

ইমারত আর কি করেই বা হবে তার ডেকরেশান। বিগঠন তখনই সম্ভব যখন গঠন সম্পর্কে প্রকৃত ধারনা স্পষ্ট হবে।

শঙ্খ ঘোষ মননশীল, যুক্তিবাদী কবি। তিনি যে আধুনিকতার কথা ভাবেন সেখানে মন্থর পুনরাবৃত্তির কোনো মানে নেই, অবাধ প্রগল্‌ভতার কোনো প্রশ্রয় নেই। তাঁর কবিতার একদিকে যেমন দেখা যায় মেধার বিচ্ছুরণ তেমনি তিনি চেয়েছেন তার কবিতার মধ্যে দিয়ে সময়কে অতিক্রম করে এক শাশ্বত দিশা দেখাতে। সুদীর্ঘ সময়ের কবিতা যাপন ও অভিজ্ঞতা কথা বলে তাঁর কবিতায়। শব্দচয়নে এবং দৃশ্যকল্প নির্মাণে তাঁর পরিমিতি বোধ ঈর্ষার দাবী রাখে। তাঁর এক একটা কবিতা যেন জীবন থেকে উঠে আসা বিচিত্র অনুভব। তাঁর সূক্ষ্ম জীবনদর্শন আমাদের পদে পদে ভাবায়–

'আমার মৃত শরীরের ওপর আহ্লাদে নাচতে থাকে
নাচতেই থাকে শুধু জলজ্যান্ত খবরের পর খবরের পর খবর।'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সারা বিশ্বব্যাপি কবিতা কোথাও যেন প্রতিবাদের মাধ্যম ও হয়ে ওঠে। কবিতা আদতে সমাজেরই দর্পন সুতরাং সেখানে সমাজের রূপ প্রতিফলিত হবে এটাই স্বাভাবিক । এই প্রসঙ্গে শঙ্খ বাবু বলেছেন– সত্যি কথা বলা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই কবিতায়। আসলে ক্ষত না থাকলে কেন কবিতা লেখা, কেনই বা কবিতা পড়া .... কবিতা তো কখনই এন্টারটেনমেন্ট হতে পারে না। কবিতা ভালোলাগা হতে পারে, অনুভূতি হতে পারে, ব্যাথার আদর হতে পারে, হতেই পারে প্রতিবাদের ভাষা।

'আমার জন্য একটুখানি কবর খোঁড়ো সর্বসহা
লজ্জা লোকাই কাঁচা মাটির তলে/'

তাঁর 'কবর' কবিতায় এক অন্যরকম চেতনার আলো ছড়িয়ে পড়েছে যা আমাদের সূক্ষ্ম অনুভূতিকে নাড়া দিয়ে যায়।

'চাই না আমি সবুজ ঘাসের ভরা নিবিড় ঢাকনাটুকু
মরা ঘাসেই মিলুক উত্তরীয়'
—এটাই কি প্রতিবাদ নয়?

আসলে নিজেকে ঠিক ভাবে চিনতে না পারলে পৃথিবীকে হয়ত চেনা যায় না। আর তাই শঙ্খ বাবুর কবিতায় বার বার ফিরে আসে আত্ম সমালোচনা। তিনি সবসময়ই কবিতার মধ্যে দিয়ে দিশা দেখাতে চেয়েছেন। ছুঁতে চেয়েছেন উজ্জ্বল আলোকবিন্দু।

তাঁর কথায়–

'সেই তুমি আমার অন্ধ দু-চোখে খুলে দাও' আবার কখনও তিনিই বলে ওঠেন 'আমি জানি তুমিও একদিন হবে বিশ্বাসঘাতক'– এটাই তো প্রকৃত চেতনার গভীরতম বিস্ফোরণ।

কবিতার সাথে প্রতিবাদের সম্পর্কে বহু প্রাচীন। আমরা জানি প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সারা পৃথিবী জুড়ে হাজার হাজার প্রতিবাদের কবিতা লেখা হয়েছে। কবিতা সেখানে হয়ে উঠেছে প্রতিবাদের ভাষা। যুদ্ধ, হানাহানি, হিংসা, ধর্ষণ, রাজনীতি ইত্যাদির প্রতিবাদে বহুক্ষেত্রেই কবিতা হয়ে উঠেছে হাতিয়ার। আমাদের দেশে সেই সময় নজরুল, সুকান্ত থেকে শুরু করে আজকের দিন পর্যন্ত প্রচুর প্রতিবাদের কবিতা লেখা হয়েছে। সমাজ সচেতন মানুষ হিসেবে শঙ্খ বাবুর কবিতায় বারবার ধরা পড়েছে অন্যায়ের প্রতিবাদ। তাঁর কলম তাই নির্দ্বিধায় গরজে ওঠে 'দল' কবিতায়—

'আমার চোখের সামনে তোমার পতন হোক'

যেহেতু শঙ্খবাবু একজন সমাজে সচেতন কবি তাই তার কবিতায় ফুটে উঠেছে আর্থসামাজিক পরিকাঠামো তথা ক্রাইসিসের ভিন্ন ভিন্ন ছবি। 'অশুচি' কবিতায় তিনি বলেছেন—

'সবাই সতর্ক থাকে দুপুরে বা মধ্যরাতে তুলে দেয় খিল
পথের ভিখিরি মা-ও ভাঙা ক্রাচে ভর করে বুঝে নেয় মাছির গুঞ্জন
আমারই সহজ কোনো প্রতিরক্ষা নেই
চুরি হয়ে যায় সব বাক্স বই সামঞ্জস্য
অথবা শুচিতা।'

স্বাধীনতার আগে একটা সময় ছিল যখন মূলত ব্রিটিশ অপশাসনের বিরুদ্ধে লেখা হয়েছে প্রতিবাদের কবিতা... সে কবিতার বৃহৎ উদ্দেশ্য ছিল দেশবাসীকে অনুপ্রেরণা দেওয়া, তাদের কে ব্রিটিশ শাসন-শোষনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করা। এরপর সময় বদলেছে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে আমাদের কাছে মূল চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় দেশ গঠন। বদলে যায় প্রতিবাদের ভাষা। খাদ্য আন্দোলন, মহামারি, অর্থনৈতিক পরিকাঠামো, সরকারী আসহযোগিতা, নকশাল আন্দোলন, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, নাগরিক জীবনের অবক্ষয়, মূল্যবোধের অবক্ষয়, নীতিহীনতা সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা-ইত্যাদির প্রতিবাদে বিভিন্ন সময়ে কবিতা হয়ে ওঠে মূল হাতিয়ার। এ প্রতিবাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতির জাগরণ। শুধু তাই নয় ধর্ম বর্ণ জাতপাতের হানাহানির বিরুদ্ধেও কবির কলম থেমে থাকেনি। 'কাগজ' কবিতায় কবি লিখেছেন—

'প্রতিদিন ভোরের কাগজে
বর্বরতা শব্দ তার সনাতন অভিধার নিত্যনব প্রসারণ খোঁজে।'

১৯৮০ সালের পর শহর কলকাতা ধীরে ধীরে বদলে যেতে শুরু করে। পুরোনো কলকাতাকে ভেঙে গড়ে উঠতে থাকে নতুন কলকাতা। শহরটা ধীরে ধীরে দক্ষিণের দিকে

সরতে শুরু করে। পুরোনো বাড়ি ভেঙে রাতারাতি গজিয়ে উঠতে থাকে একটার পর একটা গগনচুম্বি ফ্ল্যাট বাড়ি। আমাদের জীবন যাপন, মূল্যবোধ সবকিছু বদলে যেতে শুরু করে। শুরু হয় প্রোমোটার রাজ। সে যন্ত্রণা থেকে কবি লিখলেন—

'ও প্রোমোটার, ও প্রোমোটার
তোমার হাতে সব ক্ষমতার
দিচ্ছি চাবি, ওঠাও আমায় ওঠাও।'

সমাজের চরম অবক্ষয় কবি মেনে নিতে পারেন নি, কোথাও যেন তার বিবেক নিজেকেও ক্ষমা করতে পারে নি। 'ধ্বংস করো ধ্বজা' কবিতাটি তাই যেন নিজের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ। সব দেখেও কিছু বলতে না পারার যন্ত্রণা থেকে এ প্রতিবাদের ভাষা উঠে এসেছে—

'আমি বলতে চাই, নিপাত যাও
এখনই
বলতে চাই, চুপ

তবু বলতে পারি না। আর তাই
নিজেকে ছিঁড়ে ফেলি দিনের পর দিন।'

শঙ্খ বাবুর কবিতায় সুররিয়ালিজম কিংবা পরাবাস্তবের কোনো ছোঁয়া দেখা যায় না। তার কবিতায় বরং তিনি সহজ করে সহজ কথাটা বলেছেন। নিজের বিশ্বাস তথা উপলব্ধি থেকে জারিত হয়ে উঠে এসেছে প্রতিটি শব্দ। তার কবিতায় শাশ্বত ভাবনা সিরিয়াস পাঠকের মননকে স্পর্শ করে। তাঁর কবিতায় যে প্রতিবাদ সেখানে কোথাও চাটুকতা নেই, শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি সবসময় সচেতন। তিনি কখনই আবেগ কে অতিমাত্রায় প্রশ্রয় দেননি বরং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তিনি যুক্তিবাদের হাত ধরেছেন।

'আমাদের ইতিহাস নেই/অথবা এমনই ইতিহাস/আমাদের চোখমুখ ঢাকা/আমরা ভিখারি বারোমাস/পৃথিবী হয়তো বেঁচে আছে/পৃথিবী হয়ত গেছে মরে/'

একটু লক্ষ্য করে দেখলেই বোঝা যাবে শঙ্খ বাবুর কবিতায় বারে বারে উদ্ভাসিত হয় আগামীর পূর্বাভাস/তাঁর কবিতার গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যাবে চিন্তাশক্তির প্রতিটি স্তর জীবনেরই এক একটা অলিন্দ-নিলয়, যার বিস্তার লার্জার দ্যান লাইফ

'যা ঘটবার তা ঘটতে থাকে/আমরা প্রতিবাদ করি/
করতে করতে ঘুমোই/'
—এটাই তো প্রতিবাদ।

কবি বরাবরই আশাবাদী, তাঁর কবিতা এক ঝটকায় আমাদের চোখ থেকে খুলে দেয় রঙিন চশমা। জীবনের চরম সত্যকে কি অসাধারণ মুন্সিয়ানায় প্রতিষ্ঠা করা যায় তার এক সার্থক উদাহরণ আমরা দেখতে পাই 'শহিদ শিখর' কবিতায়।

'এক মরণের থেকে আরেক মরণে যেতে যেতে
আমি এই শতাব্দীর শহীদ শিখর থেকে বলি
মৃত্যুর ভিতরে আজ কোথাও মৃত্যুর নেই লেশ।"

কবি কিন্তু কোথাও নিজের প্রতিশ্রুতি থেকে সরে আসেননি। নিজের বিশ্বাস তথা মনস্তত্বকে অযথা লুকোননি কোথাও। তাঁর প্রতিটি কবিতা সৎ এবং স্বপ্রভ। কবি বিশ্বাস করেন তার কলমই একমাত্র প্রতিবাদের ভাষা, সুতরাং সেখানে তিনি বিন্দুমাত্র কম্প্রোমাইজ করতে রাজি নন। 'দেশান্তর' কবিতায় আমরা তার প্রমাণ দেখতে পাই–

'তারপর, সমস্ত পথ একটাও কোনো কথা না বলে
আমরা হাঁটতে থাকি, হেঁটে যেতে থাকি
এক দেশ থেকে অন্য দেশে
এক ধর্ষণের থেকে আরো এক ধর্ষণের দিকে'

শঙ্খবাবু রাজনীতি সচেতন, সমাজ সচেতন কবি। দেশের বিপজ্জনক হাওয়া তাঁকে ভাবায়। তাইতো কবির যখনই নৈরাজ্য দেখেছেন তার বিরুদ্ধে কলম ধরতে একবারও দ্বিধাবোধ করেননি।

সত্তরের দশকে নকশাল আন্দোলন হোক বা হাল আমলের সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম রাজনৈতিক হানাহানি, স্বেচ্ছাচারিতা, ডামাডোলের বিরুদ্ধে তিনি সর্বদাই সরব হয়েছেন। কবি বিশ্বাস করেন, যে কবি সমাজের সত্য ও মিথাকে বলতে বা লিখতে পারে না তার কবি হিসেবে অনেক আগেই মৃত্যু ঘটে গেছে। তাই সচেতন ভাবেই গোলাবারুদের গন্ধ ও অশান্তিকে কবি এড়াতে চাননি। প্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে সলিউশান খুঁজতে চেয়েছেন বারবার .....

'তোমার জপের কেন্দ্র তো শুধু
ক্ষমতাশীর্ষ নয়!'
বা
'এখন আর আমাদের কোনো অশান্তি নেই
কেননা আমরা দল বদল করেছি
হয়ে গেছি ওরা'
বা তাঁর সেই বিখ্যাত পংক্তি
'পলিশ কখনো কোনো অন্যায় করে না তারা যতক্ষণ আমার পলিশ'

বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত এই কবিতাগুলিতে কবির সচেতন বিবেক অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ওঠে। তিনি নানাভাবে মানুষের চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। সাধারণ মানুষের কর্তব্যকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চেয়েছেন মেদহীন ভাষায়। তাঁর জীবনদর্শন কোনো তরল কবিতা রচনা করে না তার স্পষ্ট উচ্চারণ তাকে মানবদরদী কবি হিসেবে চিহ্নিত করে দেয়।

শিল্পে কোনো আন্দোলনই সম্পূর্ণ কৃত্রিম হতে পারে না। আবেগ এবং অনুভব কে বাদ দিয়ে কি প্রতিবাদ হতে পারে? যা চলছে সেখান থেকে ভেঙে বেরিয়ে আসাই তো প্রতিবাদের উদ্দেশ্য। অনেক সময় চলমান ধারা থেকে নতুন ধারার জন্ম দেয় প্রতিবাদ, পৃথিবীর ইতিহাস ঘাঁটলে এর সদুত্তর পাওয়া যাবে। প্রকৃত শিল্পী আগামীকাল দেখতে পান তাই তার শিল্পের মধ্যে কেবল বর্তমান নয় প্রতিফলিত হয় ভবিষ্যতও। একজন প্রকৃত কবির কাছে এটা একটা চ্যালেঞ্জ।